ভিতরের পাতায়

- বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে নারী নির্যাতন
- ইরাকে গেরিলা হানা
- কালিম্পং-এ বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ২ এপ্রিল, ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

ভিতরের পাতায়

- আলিপুরদুয়ারে লাঠিচার্জ
- বহরমপুর সদর হাসপাতালে আন্দোলন
- বিজেপি'র ভারত উদয়

প্রচারের আলোর তলায় জমাট অন্ধকার

যারা নিজেদের অভিজ্ঞতায় কিছুই অনুভব করতে পারল না সেই কোটি কোটি মানুষের রক্ত শোষণ করা শত শত কোটি করের টাকা আত্মসাৎ করে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার যখন ঐ জনসাধারণকেই জানানোর উদ্দেশ্যে একের পর এক 'সুখানুভূতি'র বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে; যখন প্রধানমন্ত্রী 'জাতির পিতা'র ভঙ্গিতে ভারতের 'উন্নতির ঝংকার' তুলছেন; উপপ্রধানমন্ত্রী যে বাহনে চড়ে এই সেদিন মানুষ-খুনের হোলি খেলেছিলেন সেই রথযাত্রা করে দেশের 'উন্নয়নের' স্তোত্র প্রচারে ব্যস্ত, যে প্রচারের উল্লাসে গোটা দেশের মানুষের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম — চোখ ধাঁধানো সেই প্রচারের আলোর তলায় জমাট বাঁধা অন্ধকারে কী দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে লক্ষ কোটি মানুষের হাহাকার, বেরোজগারের অসহায় গুমরানি, অনাহারে মৃত্যু-মিছিলের করুণ প্রদর্শনী। আর দেখা যাচ্ছে বিকৃত মিথ্যার তরজা, যার ক্রমাগত অনুষ্ঠান সমাজে সত্যের কাঠামোটাকেই নস্যাৎ করে দিতে চাইছে।

আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে এবং তার বেশিরভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে সরকারি স্বীকৃতি অনুযায়ী ২৫/২৬ ভাগ দীন-দরিদ্র। এছাড়াও গ্রামে আছে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ যাদের প্রান্তিক বলা হয়, যাদের সংখ্যা দারিদ্র্যসীমার নিচের সংখ্যার থেকেও বেশি। এরা নিতান্তই গরিব, দু'বেলা দু'মুঠো ভাতই হয়ত জোগাড় করে কোনমতে দিন গুজরান করতে পারে — তার বেশি নয়, কিন্তু হিসাবের ফাঁকে সরকারি দারিদ্র্যসীমার নিচের স্তরে পড়ে না।

সাধারণভাবে নব্বই-এর দশকে বিশ্বায়ন নীতি চালু হওয়ার প্রায় শুরু থেকেই গ্রামীণ জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মানুষের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ কমতে থাকে। ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৭-৯৮ এই ক'বছরে মাথাপিছু বাৎসরিক খাদ্যের পরিমাণ ১৭৭.০ কিলোগ্রাম থেকে ১৭৪.২ কিলোতে নেমে যায়। কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০০-০১ এই তিন বছরে তা আরো কমে ১৫১.০৬ কিলোতে দাঁড়ায়। এই মারাত্মক হ্রাসের ফলে চারজনের একটি পরিবারে বছরে ৯০ কিলোগ্রামেরও বেশি পরিমাণ খাদ্য কমে যায়। বস্তুত এই সময়ই (নব্বই দশকে) মুষ্টিমেয় (এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশ) ধনীর পুষ্টির পরিমাণ যত বাড়তে লাগল, ব্যাপক গরিব (প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ) মানুষের সেই

তিনের পাতায় দেখুন

নোবেল স্মারক অপহরণের ঘটনা বেদনাদায়ক

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ২৫ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন —

"কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পদক সহ অন্যান্য মূল্যবান স্মারক অপহরণের ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক ও উদ্বেগজনক।

এই ঘটনা পুনরায় নগ্নভাবে দেখিয়ে দিল মুখ্যমন্ত্রী কথিত 'আইন-শৃঙ্খলার মরূদ্যান' এই রাজ্য কীভাবে ক্রিমিন্যালদের স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই ব্যাপারে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষও দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।

আমরা অবিলম্বে অপহৃত সামগ্রী উদ্ধার ও দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি।"

মদের ঢালাও লাইসেন্স বিরোধী আন্দোলনে সরকার শঙ্কিত

সি পি এম ফ্রন্ট সরকার কড়া নজর রাখছে — ১৫ মার্চ 'প্রতিদিন' পত্রিকায় এমন একটি শিরোনাম দেখে মনে হতেই পারে যে, চুরি-ডাকাতি, খুন-ধর্ষণ-নারী নির্যাতন ইত্যাদি যা রাজ্যে ক্রমাগত বাড়ছে, সরকার তা রোধ করতেই সম্ভবত পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। সংবাদে দেখা গেল, ঘটনা ঠিক উল্টো। সরকার মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, তার বিরুদ্ধে কারা আন্দোলন করছে, সরকার কড়া নজর রাখছে তাদের উপর।

এককালের বাম আন্দোলনের শরিক সি পি আই (এম) আজ সরকারি ক্ষমতায় বসে ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স বিতরণের তথা রেশন দোকান থেকে মদ বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের যুক্তি, সমাজে মদের চাহিদা বাড়ছে। ফলে শুধু লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের

আটের পাতায় দেখুন

তারকাদের আড়ালে মুখ ঢাকতে চাইছে দেউলিয়া রাজনীতিকরা

লোকসভা ভোটের দামামা বাজতেই ভোটসর্বস্ব দলগুলি সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। দেশজুড়ে বইতে শুরু করেছে প্রতিশ্রুতির বন্যা, প্রচারের পিছনে ব্যয়িত হচ্ছে শত শত কোটি টাকা। পুরনো প্রতিশ্রুতি ফিরে ফিরে আসছে নতুন শব্দবিন্যাসে, নতুন কায়দায়। বি জে পি যদি 'ফিল গুড' বা 'ইন্ডিয়া সাইনিং' দেখায়, তবে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পরিবার পিছু একজনের চাকরি, সাথে আরও অনেক কিছু। কিন্তু বহুকথিত এইসব প্রতিশ্রুতি যেহেতু জনসাধারণের মধ্যে আর তেমন করে দাগ কাটে না, তাই এইসব সংসদীয় দলগুলির নেতারা এতে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা দ্বারস্থ হচ্ছেন নানান পেশার তারকাদের, বিশেষত রুপালি পর্দার জগতের নায়ক-নায়িকা ও ক্রিকেটারদের কাছে। দেখা যাচ্ছে, এবার ঝাঁকে ঝাঁকে এইসব

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঘোষণা

চীনে সাম্প্রতিক সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে প্রতিবিপ্লব সম্পূর্ণ হল। এ বিষয়ে ২৮ মার্চ প্রকাশিত এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

— সম্পাদক, গণদাবী

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভ

শিক্ষায় ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার 'কমিউনিটি' কলেজের প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী গত ১৫ মার্চ রাজধানী শহর স্যাক্রামেন্টোতে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

ব্যাপক ফি বৃদ্ধির ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভর্তি হতে গেলে ছাত্রদের গড় মাথাপিছু ৩০০ ডলারেরও বেশি অর্থ জমা দিতে হবে।

ফি কম থাকায় এতদিন পর্যন্ত গরিব ও শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই কমিউনিটি কলেজগুলিতে পড়াশুনা করতে পারত। চাকুরি সংক্রান্ত মূল্যবান ট্রেনিং এবং সেই সংক্রান্ত সার্টিফিকেটও পেত। কিন্তু ফি বেড়ে যাওয়ায় এবার ২ লক্ষের মতো ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। এর বিরুদ্ধেই ছাত্ররা পথে নেমেছে।

দেখা যাচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের উপর পুঁজিবাদী সরকারগুলির আক্রমণ যেমন আন্তর্জাতিক ভাবেই ঘটছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনও তেমনই বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে। প্রচারমাধ্যম বর্ণিত 'স্বপ্নের দেশ' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রছাত্রীদেরও ফি বৃদ্ধি রুখতে পথে নেমে আন্দোলনে সামিল হওয়া ছাড়া আজ আর কোনও উপায় নেই। শিক্ষার ওপর নেমে আসা পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিরোধে এভাবেই দেশে দেশে দানা বাঁধছে জোরদার ছাত্রবিক্ষোভ ও আন্দোলন।

ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকা ২৫ মার্চ

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শিলচরে সভা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে শিলচরের গান্ধীভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সভানেত্রী শিখা ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্যা গীতিমালা ভট্টাচার্য। সভার মূল বক্তা বিশিষ্ট লেখিকা ঝুমুর পাণ্ডে তাঁর বক্তব্যে নারীদের চরম দুরবস্থার সমাধানে সঠিক নারী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানোর সাথে সাথে উগ্র নারীবাদী লেখিকাদেরও সমালোচনা করে বলেন যে, তাদের লেখনী যথার্থ নারী আন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে নারী মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সভার বিশিষ্ট অতিথি শিক্ষক সুব্রত নাথ যথার্থ মুক্তির উদ্দেশ্যে এযুগের অন্যতম মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে পাথেয় করে সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে নারীদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সিনেমা, হলগুলিতে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন, প্রচারমাধ্যমে নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মৃণালিনী পাল একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন দুলালী গাঙ্গুলী।

চোর ধরার নামে 'রুটি-পড়া' খাওয়ানোর প্রতিবাদে ধর্মঘট করল ছাত্ররা

দক্ষিণ বারাসাত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ হোস্টেলে দুটি ঘড়ি ও কিছু জিনিস চুরি যাওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চোর ধরার নামে গত ২০ মার্চ হোস্টেলের সুপার অধ্যাপক অচিন্ত্য হালদারের উপস্থিতিতে ''মন্ত্রপূত রুটি-পড়া'' সকল ছাত্রদের খেতে বাধ্য করা হয়। দুজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথ নস্কর (বি এস সি ৩য় বর্ষ) ও মর্শিদুল আরফ মোল্লা (বি এ, প্রথম বর্ষ) 'রুটি-পড়া' খেতে দেরি করায় তাদের চোর সাব্যস্ত করা হয়। তাদের উপর অকথ্য মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় এবং তাদের হোস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে এই ধরনের ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ কমিটির পক্ষ থেকে ২২ মার্চ নিম্নলিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে কলেজ অধ্যক্ষ ও টিচার্স কাউন্সিলের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় ও ২৩ মার্চ ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

(ক) অত্যাচারিত ছাত্রদের সম্মানের সাথে হোস্টেলে ফিরিয়ে আনতে হবে, (খ) হোস্টেলের সুপারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে, (গ) নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে, (ঘ) 'রুটি-পড়া' খাওয়ানোর উদ্যোক্তাদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে।

এই ছাত্র ধর্মঘট সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রদীপ হালদার সকল ছাত্রদের অভিনন্দন জানান।

পরে অধ্যক্ষ সহ টিচার্স কাউন্সিল দাবিগুলি মেনে নেন এবং এইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

কালিম্পং-এ বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন

পাহাড়েও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি। গত ১০ মার্চ কালিম্পং শহরে বিদ্যুৎ দপ্তরে তিন শতাধিক মানুষ মিছিল করে এসে বিক্ষোভ দেখালেন। মিটার রিডিং না নিয়ে এককালীন হাজার হাজার টাকার বিল পাঠানো, ভেঙে পড়া খুঁটি মেরামত না করা, বিদ্যুৎ সংযোগে বিলম্ব, স্কুলের সামনে হাইভোল্টেজ লাইন বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা, বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর প্রতিবাদে এ-ই'র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক অমৃত খালিং, সমশের আলি, বি বি প্রধান, এন এল শর্মা, রিঞ্চেন শেরপা, যোগবীর শাক্য, কে বি ছেত্রী এবং অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল। এ. ই. উপস্থিত জনতার সামনে এসে সমস্যাগুলি সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেই অ্যাবেকার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের চাপে শিলিগুড়ির ৪৬নং ওয়ার্ডের বিফাই বস্তিতে কর্তৃপক্ষ ইলেকট্রিক লাইনের খুঁটি দিতে বাধ্য হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

সারা বিশ্বের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মুর্শিদাবাদের মানুষও গত ২০ মার্চ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস পালন করলেন। গত বছরের এই দিনটিতেই ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মিথ্যা অজুহাত তুলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটেনকে সঙ্গী করে ইরাক আক্রমণ করে। ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং-নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের মহান ঐতিহ্যকে স্মরণ করে আগামী দিনে সংগঠিত লড়াইয়ের আহ্বান জানাতেই বহরমপুরের গ্রান্ট হলে জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রবীণ বামপন্থী নেতা প্রাণরঞ্জন চৌধুরী।

মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডোমকল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রেজিস্ট্রার বাইজিদ হোসেন। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন শিক্ষক আবু রায়হান বিশ্বাস, প্রবীণ নাট্যশিল্পী অনিলকুমার দত্ত, চন্দ্রমাধব বসু, অ্যাডভোকেট জালেপ হোসেন, শিক্ষক নেতা প্রভাত রায়চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ সনৎ কর, সূর্যসেনা সভাপতি, ভেষজ নিয়ন্ত্রণের প্রাক্তন উপঅধিকর্তা ড. বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, শিক্ষক মহঃ সেলিম, নন্দদুলাল সরকার, অপূর্ব ব্যানার্জী প্রমুখ। অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের শহীদ স্মরণে একটি শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন গৌতম সাহা। কনভেনশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌমেন দাস। আবৃত্তি পরিবেশন করেন তরুণ সরকার ও প্রশান্ত দাস। প্রাণরঞ্জন চৌধুরীকে সভাপতি এবং আবু রায়হান বিশ্বাস ও বাইজিদ হোসেনকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন খাদিজা বানু। সমর্থন করেন অ্যাডভোকেট রাজীব রায়।

বল্লীর বিল সংস্কার ও অন্যায় খাজনা প্রতিরোধে

স্বরূপনগরে কৃষক সম্মেলন

২০ মার্চ, উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর ব্লকের কাছারিবাড়ি স্কুলে অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের প্রতিনিধি সভায় কৈজুড়ী-বাঁকড়া অঞ্চল সংশ্লিষ্ট দোবিলা, গাবড়া, ভাদুড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের প্রায় শতাধিক কৃষক অংশগ্রহণ করেন। কৃষক ও মজুর জীবনের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির আক্রমণ ও দীর্ঘদিনের সমস্যা বল্লীর বিল সংস্কারের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিনিধি সভার প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই কে কে এম এস-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। তিনি বলেন, প্রচলিত ভোটবাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যাদেরকে কৃষকরা নিজেদের দল মনে করেন, এদের কোনটাই কৃষকদের দল নয়। নাহলে এদেরই রাজত্বে চাষী-মজুরের দুর্দশা এত বাড়ত না। অন্যায় খাজনা, পঞ্চায়েতি ট্যাক্স ও চাষী-মজুরের দুর্দশা বিরোধী আন্দোলনে এদের পাওয়া যেত। আন্দোলনে পাওয়া যায় কেবলমাত্র এস ইউ সি আই ও তার কৃষক সংগঠন কে কে এম এস'কে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নিজস্ব দল ও সংগঠন কোন্‌টা তা বিচার করে বুঝে নিতে হবে।

এরপর সন্ধ্যায় স্কুল মাঠে প্রকাশ্য সভায় প্রায় তিন শতাধিক চাষী-মজুর যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড দাউদ গাজী। প্রধান বক্তা ছিলেন কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স। তাঁর আলোচনায় ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়। মঞ্চের সামনে এসে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অনেকে যোগাযোগ করেন। তিনি বলেন, আগামী দিনে আরও নতুন আক্রমণ আসছে, যা প্রতিরোধ করতে না পারলে পরিবারগুলো নিঃস্ব ভিখারি হয়ে যাবে। ছোট ছোট বুথ ভিত্তিক কমিটি গঠন করে এলাকায় এলাকায় অন্যায় খাজনা ও পঞ্চায়েতি কর আদায় রুখতে আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ১০টি গণকমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটিগুলি স্থানীয় বল্লীর বিল সংস্কার সহ অন্যান্য আক্রমণগুলি নিয়ে আগামী দিনে আন্দোলন পরিচালনার অঙ্গীকার করে।

বরানগরে কনভেনশন

মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার সর্বনাশা সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২০ মার্চ ডি ওয়াই ও বরানগর ইউনিটের উদ্যোগে বরানগর পৌরসভা সংলগ্ন বিদ্যালয় ভবনে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের আহ্বান জানিয়ে এক প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক, ক্রীড়াবিদ, ক্লাবসম্পাদক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, অভিনেতা, সাহিত্যিক সহ ৩৭ জন নাগরিক। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক সাধন চক্রবর্তী। মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। প্রধান বক্তা এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক অমিতাভ চ্যাটার্জী দেখান যে, সরকার ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে মদ্যপানের সপক্ষে একটা পরিবেশ গড়ে তোলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে যাতে এই সর্বনাশা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার নৈতিক শক্তি যুবকদের মধ্যে না থাকে। সভাপতির ভাষণে সাধন চক্রবর্তী এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। কনভেনশনে ২৩ জনের ছাত্র-যুব সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।

বড়ই সুখে আছে গ্রামের মানুষ!

একের পাতার পর

অনুপাতেই পুষ্টির পরিমাণ কমে যায়। এটা ঘটছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে ঠেকে যাওয়ার জন্য। মুদ্রাস্ফীতি কমানোর বুলির আড়ালে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বিজেপি সরকার ভয়াবহভাবে বাড়িয়েছে। মানুষ ক্রমাগত কর্মহীন হয়ে পড়েছে — এই ক্রয়ক্ষমতার অভাব তারই ফল। এবং সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে রচিত কংগ্রেসের চালু করা এই তথাকথিত উদারনীতি বা উদারনৈতিক আর্থিক সংস্কার নীতি যা এই পাঁচ বছর ধরে বিজেপি সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করছে, এ তারই অনিবার্য পরিণতি। তাই সরকারি গুদামে অতিরিক্ত খাদ্য উপচে পড়ার কারণও সাধারণ মানুষের এই কেনার ক্ষমতার অভাব। ন্যূনতম খাদ্যটুকুও তারা কিনতে পারে না। সেইজন্যই ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের শেষ অবধি ৬ কোটি ৩১ লক্ষ টন খাদ্য গুদামে মজুত ছিল (যা আপৎকালীন মজুতের পরিমাণ থেকেও ৪ কোটি টন বেশি)। তা কেবল গুদামজাত হওয়ার খরচ বাড়িয়েছে, অথচ গ্রামের গরিব মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। তারা না খেয়ে অপুষ্টিতে মরেছে। আরো ভয়ঙ্কর, এই মজুতের বিরাট পরিমাণ (প্রায় ২-৪ কোটি টন) সরকার রপ্তানি করেছে, খাদ্যব্যবসায়ীদের মুনাফার জন্যে। গত ২০০২-০৩ সালে ভয়াবহ খরা পরিস্থিতির মধ্যেও বিজেপি সরকার প্রতিমাসে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টন খাদ্য রপ্তানি করেছিল। ২০০৩-র নভেম্বর মাসেই ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্য রপ্তানি হয়েছিল। শুধু কি তাই? এই রপ্তানিতে খাদ্য ব্যবসায়ীদের প্রভূত পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে খুব কম দামে বিদেশে পশুখাদ্য হিসাবে পাঠানো হয়েছে। আর এইভাবে রপ্তানি থেকে আয়বৃদ্ধির টাকা ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞাপনে প্রচার করছে। এর থেকে জঘন্য মানববিদ্বেষী নীতি আর কী হতে পারে?

আর একটি কথা, গরিব মানুষের মাথাপিছু খাদ্যপরিমাণ হ্রাস হওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে সরকার অনেক সময়ই উৎপাদন হ্রাসকে অজুহাত হিসাবে দেখায়। এটাও ডাহা মিথ্যা। কারণ যে বছর (২০০১-০২) সবচেয়ে বেশি খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল (২১ কোটি ২০ লক্ষ টন বা গড়ে মাথাপিছু ১৭৭ কেজি) তখনও এই গরিব মানুষের বাৎসরিক মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ছিল ১৫৮ কেজি, ১৯৯৮ সালের তুলনায় প্রায় ২০ কেজি কম। এমনকী যখন খরা পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে, বেশ ভাল বর্ষা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমগুলো প্রচার করেছে সেই ২০০৩-০৪ সালেও মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১৯৯৮ সালের (১৭৪ কেজি) খাদ্য পরিমাণের ধারে কাছে যায়নি, অথচ উৎপাদন প্রভূত বেড়েছিল। স্রেফ দারিদ্র্যের কারণেই, এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাবের জন্যই এই কম খেতে বাধ্য হওয়া বা খাদ্য চাহিদা কম হওয়া। ফলে খাদ্যশস্য গুদামে জমে যাওয়ার ঘটনা কঠোর সত্য হলেও তা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার, তার নিয়ন্ত্রণাধীন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সরকারের কিছু ধামাধরা কেতাবী অর্থনীতিবিদ মানতে অস্বীকার করছে। তারা নিজেদের হিসাবকেই বিদ্রূপ করে গল্প করছে, খাদ্য মজুত হওয়ার কারণ নাকি অত্যুৎপাদনের সমস্যাজনিত। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা একধাপ এগিয়ে বলছে, গরিব মানুষের দৈনিক সাধারণ খাদ্যের ভাগ কম হওয়া নাকি তাদের আরো উন্নত সুস্বাদু খাদ্যগ্রহণের ফল। তারা সব উৎকৃষ্ট খাবার খাচ্ছে বলেই তাদের ভাতরুটি ডাল খাওয়া কমে গিয়েছে। শুধু কি তাই? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের ২০০১-০২-এর বার্ষিক রিপোর্টে বলছে, গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে খাদ্যের চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হওয়ার মূলে রয়েছে অত্যধিক সহায়ক মূল্যের (support price) সমস্যা। বিশেষ করে বিশ্বজুড়ে যখন শস্যের বাজার দর কমে যাচ্ছে, তখন ভারতে সরকারি সহায়কমূল্য বেশি হওয়ার দরুন কৃষক তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থ পায়। কারা এই কৃষক ? এরা গরিব চাষী নয়। এরা কৃষি পুঁজিপতি। এরাই সহায়ক মূল্যের সুবিধা পায়। গরিব চাষী উৎপাদন খরচের অনেক কমে তাদের শস্য অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হয়। যেখানে পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের সহায়কমূল্য ঘোষণা করার কথা, যেখানে সরকারের নিজস্ব সংগ্রহকারী সংস্থা এফ সি আই (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া) কে দিয়ে ঐ সহায়ক মূল্যে ফসল কিনে নেওয়ার কথা, সেখানে কৃষক তার ফসল তোলার পর অনেক দিন পর্যন্ত সরকার কোন সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে না। এফ সি আইও ফসল কেনে না। মিল মালিকরা, মহাজনরা এর সুযোগ নিয়ে ফসলের দাম ফেলে দেয়। ফলে মহাজনের দেনার তাড়ায় গরিব চাষী অত্যন্ত কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। একেই বলে অভাবী বিক্রি। এই বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে তারা তাদের উৎপাদন খরচই তুলতে পারে না। ঋণগ্রস্ত কৃষক তখন আত্মহত্যার পথে যায়। এইভাবেই ভারতবর্ষে প্রতি বছর হাজার হাজার চাষী এমনকী পরিবারসহ জীবন বলিদান করে। ১৯৯৬-২০০০ সাল পর্যন্ত ১০,৯৫৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছিল। অন্ধ্রপ্রদেশে এইসময় ৩০০০ চাষী আত্মাহুতি দিয়েছিল। শুধু ২০০২ সালেই এই প্রদেশের তিন জেলায় (ওয়ারেঙ্গল, করিমনগর ও নিজামাবাদ) এরকমই ঋণগ্রস্ত ২৫০০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গেও প্রতি বছরই হয় সবজি চাষী বা আলুচাষী আত্মহত্যা করছে। সারা দেশেই এটা ঘটছে। এবং বাস্তব হল সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয় আসল ঘটনা তার থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ। এই যখন অবস্থা তখন সরকার পরিচালিত সংস্থা বা তাদের আশ্রিত কলমচিদের এইসব উদ্ভট যুক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাপ্রচার ছাড়া কিছু নয়। অনাহারে মৃত্যুর দরজায় যারা দাঁড়িয়ে তাদের প্রতি এই যুক্তি এক অশালীন বিদ্রূপ।

গ্রামীণ মানুষদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নানা গালভরা কর্মসূচির নাম নেতা-মন্ত্রীরা মুখে বলে বেড়ালেও বাস্তবে কোন ব্যবস্থাই কোন রাজ্য সরকারও নেয়নি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও নেয়নি। বরং আগে এজন্য যেটুকু খরচও হত, ৯০-এর দশকে আর্থিক সংস্কারের বা বিশ্বায়নের বা উদারীকরণের কোপে তার ব্যাপক অংশ সরকার ছাঁটাই করে দিয়েছে, কমিয়ে দিয়েছে। সরকারি হিসাবেই ১৯৮৫-৯০ সালে যেখানে মোট জাতীয় আয়ের ১৪.৫ শতাংশ ''গ্রামীণ উন্নয়নে'' খরচ করা হত, তা বিশ্বব্যাঙ্ক বা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নির্দেশে ১৯৯৮ সালে ৫/৬ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছিল। বর্তমানে তা আরো কম। টাকার অঙ্কে বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা এই গ্রামীণ খাতে কমেছে, যার ফলে কৃষিতে বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা থেকে দেড় লক্ষ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত আয় কমেছে। এর ফলে কৃষি থেকে প্রকৃত আয় এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশে নেমে গিয়েছে। আর এই আয়ের ভয়ঙ্কর হ্রাসের প্রত্যক্ষ শিকার যে গ্রামীণ মানুষ তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? তাইতো বেকারি-বেরোজগারিতে গ্রামীণ মানুষ বিধ্বস্ত। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার হিসাব বলছে, ১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সালে বার্ষিক কর্মসংস্থান যেখানে ২ শতাংশ ছিল, তা ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে ব্যাপকভাবে কমে মাত্র ০.৬ শতাংশ হয়েছে। অথচ বিজেপি সরকার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে কর্মসংস্থান নাকি বেড়েছে। এমনকী সংখ্যা দিয়েও বলে দিচ্ছে, চাকরি হয়েছে ৮৪ লক্ষ। মিথ্যা বলারও একটা সীমা আছে, যা রামভক্ত গেরুয়া বসনধারী বিজেপি নেতারা কুৎসিতভাবে অতিক্রম করেছে। আসলে বিজেপির ১ কোটি চাকরির গল্পটা উল্টো পড়তে হবে। অর্থাৎ, চালু ও সম্ভাব্য ১ কোটি চাকরি বছরে খতম করা হবে, যা ওরা নিষ্ঠার সাথে প্রায় রূপায়িত করে ফেলেছে। সরকারি, সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন, আধা সরকারি, বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রে কখনো স্বেচ্ছাবসরের নামে, কখনো সরাসরি বন্ধ করে বা শ্রমিক ছাঁটাই করে, এবং সর্বোপরি সমস্ত অফিস কাছারিতে নতুন নিয়োগ প্রায় বন্ধ করে দিয়ে গত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকার নিজে বা তার প্রেরণায় সমস্ত রাজ্য সরকার, ডান-বাম নির্বিচারে, এই 'প্রতিশ্রুতি' পালন করেছে।

বিজেপি সরকার বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য তারা কৃষিঋণ নীতি উদার করেছে। তারা এবার কৃষকদের ক্রেডিট কার্ড দেবে। যেখানে গরিব কৃষক দুবেলা খেতেই পায় না সেখানে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই ক্রেডিট কার্ড কাদের জন্য? অবশ্যই মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকদের জন্য। কোটি কোটি সাধারণ কৃষকরা কোনদিন এই ঋণ পাবে না, পেতে পারে না।

বস্তুত এই গ্রামীণ ধনী কৃষকদের পক্ষেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সহ কংগ্রেস, টিডিপি, মুলায়ম, জয়ললিতা, সি পি এম পরিচালিত রাজ্য সরকার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন নীতির অনুসরণে তাদের কৃষিনীতি পরিচালিত করছে। তাই শহরের ধনী সম্প্রদায় সহ গ্রামের ধনী কৃষকরা যখন সরকারি কর মকুব, সরকারি মদতে কর ফাঁকি, ঋণমকুব ইত্যাদির ফলে ফুলেফেঁপে উঠছে, তাদের নানাবিধ খাদ্যের প্রাচুর্য বাড়ছে, তখন শহরের শ্রমজীবী ও গ্রামীণ সাধারণ কৃষিজীবী মানুষদের প্রকৃত আয় শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। সরকারগুলো যতই মিথ্যাপ্রচার করুক, গরিব-মধ্যবিত্ত চাষীদের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। অনাহারে-অর্ধাহারে তীব্র অপুষ্টির শিকার হচ্ছে তারা। আমাদের দেশে ৩০ বছর আগে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের হিসাবে দারিদ্র্য বিচার হত, (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, ২৮তম রাউন্ড, ১৯৭৩-৭৪) সেই ২৪০০ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের অর্ধেকও এদেশের বিশাল গ্রামীণ জনসাধারণ আজ পায় না। ১৯৯৯-২০০০ সালের হিসাবে মাত্র গ্রামাঞ্চলের এক-দশমাংশ মানুষ এই খাদ্য পায়।

এই হচ্ছে বিশ্বায়ন-উদারীকরণ নীতির পরিণতি। বিজেপি সরকার নির্মমভাবে দেশি - বিদেশি পুঁজিপতিদের বা বহুজাতিক একচেটিয়া শিল্পপুঁজির স্বার্থ রূপায়িত করে যেমন শ্রমিক-কর্মচারীদের ধ্বংস করছে, তেমনি গ্রামেও গ্রামীণ পুঁজিপতিদের স্বার্থে ঐ নীতি প্রয়োগ করে কৃষিজীবী মানুষকে ধ্বংস করছে। এই ধ্বংসের বাস্তব প্রতিক্রিয়াকে চাপা দেওয়ার জন্যই জনসাধারণেরই টাকায় এই মিথ্যা বিজ্ঞাপন, যাতে গ্রাম-শহরের ধনিকশ্রেণীর সেবায় আবার তারা আত্মনিয়োগ করতে পারে আগামী নির্বাচনে জিতে।

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবার পাঞ্জাব থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেই বলেছেন, খাদ্যের অভাবে কৃষকদের মৃত্যুর জন্য কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি দায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার নয়। কেন্দ্রের গুদামে খাদ্য মজুত ছিল, কংগ্রেসের রাজ্য সরকারগুলি তা নেয়নি। এই অভিযোগের জবাব কংগ্রেসকেই দিতে হবে। কিন্তু বাজপেয়ী এমন ভাব দেখালেন যেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আর্থিক নীতি কংগ্রেসের থেকে আলাদা কিছু। বাস্তবে আদৌ তা নয়। কৃষিক্ষেত্রে বিজেপি সরকারের যে নীতির পরিণামে আজ চাষীরা বিপন্ন, কংগ্রেসের হাত দিয়েই সেই নীতির রূপায়ণ শুরু হয়েছিল, বিজেপি সরকার যার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল, কেন্দ্রের সরকার মানে সারা দেশের সরকার। কোন একটি বা একাধিক রাজ্যে যদি মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যায়, তখন রাজ্য সরকারের মতই কেন্দ্রীয় সরকারেরও কি দায়িত্ব বর্তায় না খাদ্য যোগান দেওয়ার ? বিশেষ করে যখন কেন্দ্রের গুদামে খাদ্য মজুত আছে। কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলো কেন সেই দাবি তুলল না? কেন্দ্রের সরকারও বা সেই ব্যবস্থা কেন করল না? উল্টে বাজপেয়ীজীরা কেন কম দামে সেই খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করে দিলেন?

এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে, কী কংগ্রেস, কী বিজেপি বা অন্যান্য দল পরিচালিত সরকারগুলি, কারোরই জনসাধারণ বাঁচল না মরল, তা নিয়ে ভাবনা নেই। পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ চা- বাগানগুলিতে শত শত শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনায় সি পি এম- ফ্রন্ট সরকারের নির্দয় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা এদের চরিত্র উদঘাটিত করে দিয়েছে।

এরাই এখন নির্বাচনের সময় জনগণের ভোট চাইতে ঘুরবে। অথচ, এদের মধ্যে যে দলই জিতুক, জনগণের জীবনে কোনও স্বস্তি এরা এনে দেবে না। জনসাধারণকেই খাদ্যটুকুও লড়াই করে আদায় করতে হবে। সেই লড়াইয়ে যে দল থাকবে, যে দল জনগণের হয়ে লড়াই করার জন্যই নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে, তেমন দলকেই তো চিনে নিয়ে ভোট দেওয়া উচিত জনগণের। একমাত্র তাহলেই জনগণের বাঁচার লড়াই শক্তিশালী হবে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে

নারী নির্যাতন ও প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতি

(গত সংখ্যার পর)

বর্তমান সমাজ একদিকে পুঁজিবাদী অপরদিকে পুরুষ শাসিত। চিরকাল এমন ছিল না — থাকবেও না। আদিম যুগে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, কোন স্থায়ী সম্পত্তি ছিল না, তখন সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, মায়ের পরিচয়ই ছিল সন্তানের পরিচয়। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন ঃ চাষবাসের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য এসে গেল এবং মেয়েদের সন্তান ধারণ করতে হয় বলে এই নতুন পরিস্থিতিতে তারা শ্রমের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ল। পুরুষরা সেই সুযোগে স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং নিজেদের আধিপত্য মেয়েদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিল। ব্যক্তিসম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরুষশাসিত সমাজের স্বার্থের অনুকূলে তাদের মানাবার জন্য নীতি-আদর্শ অনেক কিছুই আসতে থাকল এবং ধীরে ধীরে মেয়েরা তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। কালক্রমে মেয়েরাও পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হল। তারপর এমন অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল যে, আমরা দেখতে পাই মেয়েরা নিজেরাই স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলছে।

মাতৃশাসিত সমাজ থেকে পুরুষ শাসিত সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেছেন ঃ ''মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হল শৃঙ্খলিত, পদানত, পুরুষের দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।'' এই বক্তব্যের সাথে মার্কস একটু যোগ করে বলেছেন ঃ ''আধুনিক পরিবারের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থায় শুধু দাসত্ব নয়, পরন্তু ভূমিদাসত্বও আছে, কারণ গোড়া থেকেই এটির সঙ্গে কৃষি বেগারীর সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যত রকমের বিরোধ দেখা দিয়েছে তার সবই ছোট আকারে এর মধ্যে আছে। ...ইতিহাসে এক বিবাহ দেখা দিল মোটেই স্ত্রী-পুরুষের সদ্ভাব সূত্রে নয়, বরং তা দেখা দিচ্ছে নারী-পুরুষের একজন কর্তৃক অপরের ওপর আধিপত্য হিসাবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং এযাবৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা বৈরীর ঘোষণা রূপে।'' ''...শ্রমের প্রথম বিভাগই হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের বিভাগ।'' এঙ্গেলস যুক্ত করেছেন, ইতিহাসে শ্রেণীবিরোধ প্রথম যা দেখা দেয় সেটা মিলে যায় এক পতি-পত্নী বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিরোধের বিকাশের সঙ্গে। প্রথম শ্রেণীপীড়ন মেলে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির ওপর পীড়নের সঙ্গে। এক পতি-পত্নী বিবাহ ইতিহাসের একটা বড় অগ্রসর পদক্ষেপ। কিন্তু সেই সঙ্গেই দাসপ্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পদ সহ তা এমন এক যুগের পত্তন করে যা আজও চলছে এবং যাতে প্রত্যেকটা অগ্রগতিই হচ্ছে সেই সঙ্গে একটা আপেক্ষিক পশ্চাৎগতি, যেখানে জনসমষ্টির একাংশের স্বচ্ছলতা ও উন্নতি হয় অপর এক অংশের দুঃখ ও পীড়নের মধ্য দিয়ে। এক পতি-পত্নী বিবাহ হচ্ছে সভ্য সমাজের কোষ রূপ, এখানে আমরা সেইসব বৈরিতা ও বিরোধের প্রকৃতি লক্ষ্য করতে পারি যেগুলি শেষোক্তের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে।...

সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকারের জন্য এক পতি-পত্নী প্রথা ও পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ব্যক্তিসম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পণ্য উৎপাদনের চূড়ান্ত বিকশিত এবং চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল রূপটি আমরা পাই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি ও জীবন ব্যবস্থায়। আধুনিক পরিবার তারই ক্ষুদ্র কোষ।

যখন থেকে বৃহৎ শিল্প স্ত্রীলোককে ঘর থেকে শ্রম বাজারে ও কারখানায় পাঠাল এবং প্রায়ই তাকে পরিবার পালনে রোজগার করতে হল তখন থেকে প্রলেতারিয় (সর্বহারা) সংসারে পুরুষের যা কিছু ভিত্তি ছিল সবই লোপ পেল। ...এইভাবে প্রলেতারিয় পরিবার সঠিক অর্থে আর এক পতি-পত্নীক নয়, অন্তত ঐতিহাসিক অর্থে।'' নারীর নিছক উৎপাদন যন্ত্র ও পণ্য হিসাবে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক সমাজে অবস্থানটা পুঁজিবাদের সঙ্কট বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ নগ্ন, কুৎসিত রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা এবং বিকাশের পর্বে নারীর সম্ভ্রম, নারী হিসাবে ব্যক্তিমূল্য যাই থাক — ইতিহাসের গতিপথে যখন পুঁজিবাদ মুমূর্ষু প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছেছে তখন আর কোনভাবেই কোনো ভাবালুতা আরোপিত সৌন্দর্যের মিথ্যা প্রলেপ তার ঐতিহাসিক কদর্যতাকে ঢেকে রাখতে পারে না। আজ সেটাই হচ্ছে। পৃথিবীজোড়া পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা একদা নারীকে যে মূল্য, অধিকার দিয়ে মহিমান্বিত করেছিল তা আজ অন্তর্হিত। বাণিজ্য সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধির সামনে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও মুনাফার লালসা হয়ে উঠেছে নগ্ন ও বেপরোয়া।

বিশ্বব্যাঙ্কের একটা বিভাগ আছে, নাম — মহিলা উন্নয়ন বিভাগ (WDP) — যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হ'ল মহিলাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ভূমিকা গ্রহণ করা। লস এঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, বোস্টন ও অন্যান্য শহরগুলিতে পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছে অজস্র। এগুলিতে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া, শিশুশ্রমিক নিয়োগ না করা, ইনসিওরেন্স-ওভারটাইমের পয়সা দেওয়া এসবের কোনো বালাই নেই। শ্রমিকরা কাজ করে ১৬-১৮ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৭ দিনই কাজ করে, ওভারটাইমের পয়সা পায় না। এদের ৯০ শতাংশ হচ্ছে মহিলা শ্রমিক। ক্যারিবিয়ান এলাকা, এশিয়া, মধ্য আমেরিকা থেকে এরা এসেছে। তৃতীয় দুনিয়ার এই মহিলারা আধুনিক শিল্পব্যবস্থার মালিকদের আকাঙ্ক্ষিত শ্রমিক। এইসব মহিলারা অল্প মজুরির জন্য বাকি সময় দেহ ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে বাধ্য হন। এই জঘন্য শোষণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করা হলে আই এম এফ-এর মহিলা বিভাগের প্রধানা জবাব দেন ঃ ''আমাদের কাজ হল দারিদ্র্য দূরীকরণে সাহায্য করা। বহুজাতিক সংস্থাগুলি যদি কম মজুরি দেয় তা দেখবার দায়িত্ব আমাদের নয়। এটা দেশের সরকারের কাজ।'' আশ্চর্য! আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক কিন্তু ঋণের শর্ত জুড়ে দিয়েছে — সরকারি ব্যয় কমাতে মজুরি কমাতে হবে। মালয়েশিয়ার সরকারের একটা বিজ্ঞাপন এই রকম ঃ এশিয়ার মহিলাদের শারীরিক দক্ষতার সারা বিশ্বেই নাম রয়েছে। হাত দুটো তাদের ছোট হলেও সেই হাতে দ্রুত ও যত্ন নিয়ে তারা কাজ করে। তাদের সাথে কার তুলনা চলে? তাই আমাদের শিল্পোৎপাদনে সমৃদ্ধির জন্য প্রকৃতিদত্ত ঐতিহ্যলালিত এই জন্মদক্ষ এশিয়ার মহিলা শ্রমিক ছাড়া কার কথাই বা ভাবা যায়? (Bulletin of Asian Scholars, April-June 1980)

কীভাবে তারা বাঁচে? মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলি চালিত এইসব সংস্থায় মহিলারা থাকে ফ্যাক্টরির কাছে বস্তির ছোট ছোট ঘরে, এক একটা ঘরে গাদাগাদি করে। প্রাতঃকৃত্য বাইরে সারতে হয়। ঘুমানোর ব্যবস্থাও অদ্ভুত। তিনটে শিফ্‌টে কারখানায় কাজ হয়। ঘুমানোতেও তাই শিফ্‌ট ব্যবস্থা। (Women in Global Factory) ফিলিপাইনে সরকারি আয় বৃদ্ধির অন্যতম ব্যবসা হল ট্যুরিজম। এটা প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আনে। মনোরঞ্জন শিল্পে সরকার বিরাট 'সাফল্য' অর্জন করেছে — যার বেশিরভাগ ভোক্তাই হল বিদেশি ধনাঢ্য ব্যক্তি, পুঁজিপতি, বশংবদ অফিসার। এই মনোরঞ্জক মহিলার সংখ্যা ১ লক্ষ। বেসরকারি হিসাবে অসংখ্য। ম্যানিলায় '৭৬ সালে আই এম এফ-এর সম্মেলনের জন্য যে বিশাল বাড়িটি তৈরি করা হয় সেটা এখন বেশ্যাবৃত্তির ভাড়া বাড়ি। এশিয়ায় ট্যুরিজম শিল্পের রমরমা ব্যবসাই হল বহুজাতিক সংস্থাগুলির মুনাফাদায়ী শিল্প, যার কেন্দ্রবিন্দু হল — মনোরঞ্জক মহিলা (hospitality girls), হাজার হাজার মহিলার ইজ্জত লুণ্ঠনের ব্যবসা। দক্ষিণ কোরিয়ায় দেহোপজীবিনীদের দেহ নিংড়ে সরকার প্রতি বছর ২৭ কোটি টাকা মুনাফা করে থাকে। ...বহুজাতিক সংস্থা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই সবের জন্য হোটেল এজেন্সিতে প্রচুর অর্থ লগ্নী করে বসে আছে।

ভারতবর্ষও ব্যতিক্রম নয়। এমনকী কলকাতাও নয়। তিন হাজার কোটি টাকার ভোগ্যপণ্যের বাজার ধরতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির গলাকাটা প্রতিযোগিতার ফলে জন্ম নিয়েছে নানা রকম 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা'। 'ভারত সুন্দরী', 'এশিয়া সুন্দরী', 'বিশ্বসুন্দরী' এমন কত কি! এরই সাথে জড়িয়ে থাকছে বিজ্ঞাপনে অশ্লীলতা ও ফ্যাশন শিল্প। জনৈক কর্পোরেট শিল্পপতিকে ফ্যাশন-এর মর্মবস্তু কি, জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন ঃ ''যৌনতাকে যা উদ্দীপ্ত করে তেমন ডিজাইনই ফ্যাশন।'' এই ফ্যাশন শিল্পে লগ্নীকারীদের মুনাফা লালসা চরিতার্থ করতেই ''মডেলিং'' পেশাকে ঘিরে উন্মাদনা তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রবৃত্তির অন্ধ উন্মাদনার বিষ আজ দেশে দেশে পরিবারগুলিতে লোভ- লালসা, স্বার্থপরতা, নৈতিক অধঃপতনের জোয়ার আনছে। খোদ আমেরিকার অবস্থাটা কোথায় পৌঁছেছে? আমেরিকার শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন রাষ্ট্রসচিব জে বেনেট '৯৩ সালে ওখানে হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ২০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে জনজীবনের নীতিনৈতিকতা নিয়ে একটা উদ্বেগময় বক্তৃতায় বলেন, ''যদিও আমরা জাগতিক ভোগসুখে আছি, কিন্তু আমরা চরিত্র নিয়ে বেঁচে নেই। ...গত ৩০ বছরে হিংসাত্মক ঘটনা বেড়েছে ৫৬ শতাংশ, অবৈধ সন্তানের জন্ম বেড়েছে ৪০০ শতাংশ, বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়েছে ৪০০ শতাংশ, পিতামাতা পরিত্যক্ত সন্তানের সংখ্যা বেড়েছে ৩০০ শতাংশ, অল্প বয়সীদের আত্মহত্যা বেড়েছে ২০০ শতাংশ। আর, হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গড় মেধা কমেছে ৪৫ পয়েন্ট।'' (সর্বগ্রাসী অক্টোপাস, পৃ ৭৬) ১০ বছর পূর্বেকার এই ছবিটা আজ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ''বর্তমানে আমেরিকায় ৫০ শতাংশ মহিলা যে পুরুষদের সাথে বাস করেন, তাদের দ্বারা প্রহৃত হন, এমনকি প্রহারে মৃত্যুও ঘটে।'' আর, ধর্ষণের কথা যদি ধরি, তবে ''আমেরিকায় প্রতি বছর ৫ লক্ষ মহিলা ধর্ষিতা হন।'' যে আমেরিকা স্বাধীন হয়েছিল রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে — সেই সভ্যতা বর্তমানে পৌঁছেছে এক নরকের প্রান্তসীমায় — প্রতি তিনজন বয়স্ক নারী ও কিশোরী মেয়ের মধ্যে ১ জন অবশ্যই সারা জীবনে হয় পুরুষের প্রহার, নাহয় নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে।' (হু রিপোর্ট '৯৭, দি স্টেটসম্যান ২৩-৫-২০০৩) নারী নামক পণ্যটির পাচারও কম নয় — যৌনব্যবসা, গৃহস্থালির কাজকর্মের দাসী, নাহয় ''বাধ্যতামূলক শ্রমে'' ব্যবহার করার জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর ১০ লক্ষেরও বেশি নারী ও শিশু পাচার হয়।''

বৃহত্তম পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষও কম যায় না। ''ভারতবর্ষের বেশ্যালয়গুলিতে ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার নেপালি নারী ও মেয়েরা রয়েছে, এদের মধ্যে ৩৫ শতাংশকেই আনা হয়েছে বিবাহ ও ভাল চাকরির মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে'' (দি স্টেটসম্যান ২৩-৫-০৩)। 'পবিত্র পরিবার'কে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নিবিড় যোগসূত্রে ভারতের পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে চুরমার করে পৌঁছে দিচ্ছে অন্ধকারের গর্ভে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ভারতের পারিবারিক ব্যবস্থার অন্তরালে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা শিশুদের যৌনপীড়ন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। আর এ এইচ আই ফাউন্ডেশন সমীক্ষায় দেখেছে, দিল্লির কলেজ ছাত্রছাত্রীদের ৭০.৫ শতাংশই জানিয়েছে যে, মহিলা ছাত্রীরা তাদের শিশুজীবনের যৌননিগ্রহের কথা আলোচনা করে ...পরিবারের কারোর দ্বারা যৌননিগ্রহের কথা স্বীকার করেছেন ৪০ শতাংশ মহিলা।'' (দি টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১০-১-০৪)

পুঁজিবাদের চরম সঙ্কট মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে, পারিবারিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধগুলিকে ভেঙে দিচ্ছে। নরনারীর স্বাভাবিক পরিবার ও দাম্পত্যজীবনের বিকল্প হিসাবে পুত্রকন্যার দায়বর্জিত 'লিভ টুগেদার' এবং 'সমলিঙ্গের যুগলবন্দী'র জীবনযাত্রার দাবি পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আজ সংবিধান স্বীকৃত অধিকারের জন্য বিদ্রোহ করছে। এমনকী এই মানসিকতার প্রতিফলন ভারত-বাংলাদেশের মত দেশগুলিতেও ক্রমশই দেখা যাচ্ছে। দায়-দায়িত্বহীন অনুৎপাদক অনৈতিক যৌন আনন্দের বাজার এমন পটভূমিতেই গড়ে উঠছে, বাড়ছে। তাই পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য সংবাদপত্র আনন্দবাজার (২৬-৮-২০০০) লেখে ঃ ''আর পাঁচটা পেশা বা জীবিকার মত দেহব্যবসাও একটা জীবিকা বলে মানা হচ্ছে। এর সঙ্গে নৈতিকতা বিষয়টি না জুড়ে একটা নিয়মিত, স্বাভাবিক এমনকী সামাজিক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়ে অনেক রাষ্ট্র এ পেশায় নিযুক্তদের অধিকার মঞ্জুর করেছে। ফলে ওইসব দেশে তারা কোনো অপরাধবোধে ভোগে না। নিজেদের ও পরিবারের সবার জন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পুষ্টি ও বিকাশের জন্য ইউনিয়নবদ্ধ হয়ে তারা দরকষাকষি পর্যন্ত করতে পারে। ...উদার আধুনিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাই উদারনৈতিক আর্থিক সংস্কারে কাম্য। মহিলাদের অধিকার, অগ্রগতি, বিকাশ ও আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন — মহিলাদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণ বিল সবই একই পথের পথিক।'' এইভাবে পতিতাবৃত্তিকে নৈতিকতার ওপর দাঁড় করানোর নির্লজ্জ প্রয়াস আজ বিশ্বব্যাপী চলছে। নারীর মননজগতও তার শিকার হয়ে যাচ্ছে।

সমাজকথিত নিম্নবর্গের নারীদের করুণ অবস্থার কথা আমরা বলেছি। তফসিলি জাতি ও উপজাতির রূঢ় জীবনের চালচিত্রটিও কিন্তু অখণ্ড নয়। এই সমস্ত বর্গের ক্ষেত্রগুলিও কিন্তু

সাতের পাতায় দেখুন

ইরাকে গেরিলা আক্রমণ অব্যাহত

২০ মার্চ ঃ ইরাক আক্রমণের বর্ষপূর্তির দিন ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধারা ইরাক জুড়ে ''দালাল খতম অভিযান'' চালিয়েছে। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল মার্কিন দালাল ইরাকি পুলিশ বাহিনী। এদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আক্রমণে শতাধিক দালাল পুলিশ হতাহত হয়েছে। প্রতিরোধ যোদ্ধারা দক্ষিণ ইরাকে একটি তেলের পাইপ লাইন উড়িয়ে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে ইরাক জুড়ে গেরিলা কার্যকলাপের জেরে এদিন ১০০ বিলিয়ন দিনার (ইরাকি মুদ্রা) মূল্যের সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। (রয়টার্স, ডেকান হেরাল্ড, ২১-৩-০৪)

২১ মার্চ ঃ পশ্চিম ইরাকের মনসুর এলাকায় মার্কিন সেনাদের লক্ষ্য করে রকেট ছোঁড়া হলে দু'জন মার্কিন সেনা নিহত এবং পাঁচজন আহত হয়েছে। বাগদাদে জোট সেনাদের সদর দপ্তর লক্ষ্য করে তিনটি রকেট ছোঁড়া হয়। তাতে একজন নিহত ও পনের জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে পাঁচজন মার্কিন সেনা। (এ পি, হিন্দু, ২২-৩-০৪)

২২ মার্চ ঃ রাস্তায় রাখা বোমা ফেটে আবু ঘারেইব অঞ্চলে একজন মার্কিন সেনা ও একজন ইরাকি দোভাষী মারা গেছে এবং আটজন মার্কিন সেনা আহত হয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রথম আর্মার্ড ডিভিশানের এক প্লেটুন (সংখ্যায় ৩০ জন) সেনা আবু ঘারেইব অঞ্চল দিয়ে মার্চ করে যাবার সময় এই

বিস্ফোরণ ঘটে। (রয়টার্স, এশিয়ান এজ্ ২৩-৩-০৪)

২৩ মার্চ ঃ উত্তর বাগদাদে মার্কিন বিমানঘাঁটির কাছে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে দু'জন নিহত ও পঁচিশ জন আহত হয়েছে। অপর একটি ঘটনায় দক্ষিণ বাগদাদে গেরিলারা গুলি করে দুজন ফিনল্যান্ডের নাগরিককে হত্যা করেছে। উল্লেখ্য, এরা জোট সেনাবাহিনীতে নানান প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতো। সে অর্থে এরা জোট সেনাদের সহযোগী। (এ পি, হিন্দু, ২৪-৩-০৪)

২৪ মার্চ ঃ উত্তর ইরাকের তৈলনগরী কিরকুক শহরের দক্ষিণে একটি চলমান গাড়ি থেকে পুলিশ দপ্তর লক্ষ্য করে দু'টি রকেট ছোঁড়া হলে দু'জন ইরাকি পুলিশ নিহত ও পাঁচজন পুলিশ গুরুতর আহত হয়েছে। (রয়টার্স, এশিয়ান এজ্ ২৫-৩-০৪)

বাগদাদের সবচাইতে নামী হোটেল ইশতার শেরাটন হোটেলের প্রাঙ্গণে গেরিলারা রকেট ছোঁড়ে। রকেটের ঘায়ে একজন বিদেশি ঠিকাদার মারা গেছে। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে 'গ্রিন জোন' নামে পরিচিত অতি সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে অবস্থিত জোট সেনাদের সদর দপ্তর লক্ষ্য করে গেরিলারা আরও দুটি রকেট ফাটালে দু'জন মার্কিন সেনা মারা গেছে।

(রয়টার্স, আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫-৩-০৪)

২৫ মার্চ ঃ উত্তর ইরাকে পথের ধারে পেতে রাখা গ্রেনেড ফেটে একজন মার্কিন সেনা মারা যায়।

বাকুবা শহরে মার্কিন প্রথম পদাতিক ডিভিশনের টাস্ক ফোর্সের টহলদারি সেনাদের উপর গেরিলারা আক্রমণ চালায়। টাস্ক ফোর্সে সেনা সংখ্যা ছিল ৪০ জন। সংঘর্ষে দুজন মার্কিন সেনা ও তিনজন গেরিলা যোদ্ধা নিহত হয়। (এ পি, হিন্দু, ২৬-৩-০৪)

উত্তর ইরাকের তাজি শহরের গেরিলারা মার্কিন সেনাদের উপর আক্রমণ চালালে একজন মার্কিন সেনা নিহত ও অপর একজন আহত হয়েছে।

ফালুজা শহরে ইরাকি গেরিলা ও মার্কিন সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জন মার্কিন সেনা নিহত ও ২৬ জন আহত হয়েছে। অন্যদিকে ১০ জন ইরাকি গেরিলা প্রাণ হারিয়েছে। (ডিপিএ, ডেকান হেরাল্ড, ২৬-৩-০৪)

বন্ধ বাগান খোলার দাবিতে আন্দোলন

আবার রক্তাক্ত চা-শ্রমিক

শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার, আবার রক্তাক্ত চা-শ্রমিক। গত ১০ ডিসেম্বর বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবিতে শিলিগুড়িতে আইন-অমান্য আন্দোলনে নৃশংসভাবে লাঠি চালিয়ে রাজ্য সরকারের পুলিশ রক্তাক্ত করেছিল চা-শ্রমিকদের। আবারও গত ২৪ মার্চ আলিপুরদুয়ারে আন্দোলনরত চা-শ্রমিকদের উপর র‍্যাফ, 'কমব্যাট ফোর্স' ও পুলিশের মিলিত বাহিনী নির্দয়ভাবে লাঠি চালিয়ে চা-শ্রমিকদের রক্তাক্ত করল। মাথা লক্ষ করে লাঠি চালিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিল পুলিশ। আহত ও রক্তাক্তদের টেনে-হিঁচড়ে ভ্যানে তুলে গ্রেপ্তার করল তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

উল্লেখযোগ্য, সেদিন ভারত-পাক এক দিবসীয় ক্রিকেটের নির্ণায়ক ম্যাচ খেলা চলছিল। বেশিরভাগ মানুষ টিভিতে খেলা দেখছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের এই ভূমিকার কথা প্রচার হতেই বহু সাধারণ মানুষ ছুটে আসেন আলিপুর দুয়ার পার্টি অফিসে, কর্মীদের খোঁজখবর নিতে থাকেন। আইনজীবী ও ল-ক্লার্করা সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের জামিনের ব্যবস্থা করেন।

ঘটনার প্রতিবাদে ২৬ মার্চ আলিপুরদুয়ার মহকুমায় 'প্রতিবাদ দিবস' পালন করা হয়। যে এস-ডি-ও অফিসের সামনে ঘটনা ঘটেছে তার কর্মচারীরাও প্রতিবাদ ব্যাজ পরে অফিস করেন। কোর্টের প্রায় সব আইনজীবীই ব্যাজ ধারণ করেন। বিভিন্ন স্থানে পথসভায় হাজির হয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ ও চা-শ্রমিক।

দীর্ঘদিন ধরেই নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং এস ইউ সি আই কর্মীরা বন্ধ চা-বাগান সরকারি অধিগ্রহণ করা, চা-শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন, পানীয় জলের সরবরাহ, চিকিৎসা সহ প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। ডেপুটেশন, বিক্ষোভে কাজ না হওয়াতে ১০ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে আইন অমান্য আন্দোলন হয়। এরপর স্থানীয় বিক্ষোভগুলি সংগঠিত করে ১লা মার্চ অসম সীমান্ত থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চা-শ্রমিকরা সাইকেল মিছিল করে ডি-এমের কাছে আবার ডেপুটেশন দেয়। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়াতে অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। ২৪ মার্চ আলিপুরদুয়ার কালচিনি ও রংধামালীতে অবরোধ বিক্ষোভ হয়। কালচিনিতে বিডিও অফিসের প্রাঙ্গণ থেকেও ৪৫ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

উল্লেখ্য, এইসব আন্দোলনের চাপে সরকার কয়েক দফা 'রিলিফ' ঘোষণা করতে বাধ্য হলেও বাস্তবে তা কার্যকরী করেনি। তাই চা-শ্রমিকরা শহীদ ভগৎ সিং দিবসটি 'সঙ্কল্প দিবস' হিসাবে পালন করে আরো জোরদার আন্দোলনের শপথ নিয়েছে, প্রয়োজনে আরো রক্ত তারা দেবে।

মজঃফরপুরে
এ আই ডি এস ও'র শিক্ষা কনভেনশন

২০ মার্চ মজঃফরপুরের এল এস কলেজে ডি এস ও'র উদ্যোগে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং মজঃফরপুর জেলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক শ্রী বি প্রশান্ত। কংগ্রেস সরকারের প্রবর্তিত সর্বনাশা শিক্ষানীতি যা বর্তমানে বিজেপি কার্যকরী করে চলেছে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এআইডিএসও'র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক বিপিন বিহারী প্রসাদ, অধ্যাপক বি এন শর্মা, ডি এস ও'র বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড রামপ্রীত রায়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের মজঃফরপুর জেলা সভাপতি কমরেড সঞ্জয় যাদব।

মুর্শিদাবাদে

বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

গত ১৮ মার্চ বহরমপুর সাব-ডিভিশনাল বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হরিহরপাড়ায়। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। ইউনিয়নের সম্পাদক আনিসুল আম্বীয়া সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন। বহরমপুর, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি এলাকা থেকে আগত বিড়ি শ্রমিক প্রতিনিধিদের আলোচনায় অধিবেশন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অল ইন্ডিয়া বিড়ি ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ও ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য কমরেড অশোক দাস বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি অধিবেশনে জয়নাল আবেদিনকে সভাপতি, আনিসুল আম্বীয়াকে সম্পাদক, খোদাবক্স মণ্ডলকে সহ-সম্পাদক ও দেবাশীষ গাঙ্গুলীকে সহ-সভাপতি করে ১৫ জনের একটি কমিটি নির্বাচিত হয়।

প্রতিনিধি অধিবেশন শেষে বিড়ি শ্রমিকরা মিছিল করে হরিহরপাড়া মোড়ে সমবেত হন। সেখানে প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। তিনি বলেন, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য যে আইন আছে, কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলি তা মানতে মালিকদের বাধ্য করছে না। তারা মুখে শ্রমিক দরদের কথা বললেও বাস্তবে মালিক তোষণ করছে। এবং এই পথেই তারা ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। ক্ষমতাসীন দলগুলির প্রতি সমস্ত রকম মোহ ছেড়ে যথার্থ শ্রমিকস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সূতীর বৈষ্ণবডাঙ্গায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের ন্যায্য টাকা আদায়ের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত বিড়ি শ্রমিক কমরেড মজিবর রহমানের মৃত্যুর দিন ১২ জুনকে শহীদ দিবস হিসাবে পালন করার জন্য তিনি সারা দেশের বিড়ি শ্রমিকদের কাছে আহ্বান জানান। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি কমরেড আবদুস সঈদ।

১৮ মার্চ বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত বিড়ি শ্রমিকদের একাংশ

হাসপাতাল তুলে দিলে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদও অশান্ত হবে

বহরমপুর কনভেনশনে প্রবীণ নাগরিকদের ঘোষণা

'বহরমপুর শহরের মধ্যস্থল থেকে প্রাচীন সদর হাসপাতাল তুলে দেবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। এই আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ। কিন্তু প্রশাসন যদি এই আন্দোলন ভাঙতে হিংসার আশ্রয় নেয় তবে বহরমপুরের মানুষ শান্ত থাকবে না।' ২১ মার্চ, ২০০৪ বহরমপুর গ্রান্ট হলে এক নাগরিক কনভেনশনে শহরের প্রবীণ নাগরিকগণ এ কথা বলেন। প্রধানত লালগোলার রাজপরিবারের দানে এবং সাধারণ মানুষের আগ্রহে স্বাধীনতার অনেক আগে বহরমপুর শহরের মধ্যস্থলে সদর হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল। তারপর এই গুরুত্বপূর্ণ জেলা সদর শহরে জনসংখ্যা বেড়েছে ব্যাপক হারে। বেড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংখ্যাও। আবার এ জেলা ছাড়াও নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদহ প্রভৃতি জেলার রোগীরাও বহরমপুরে চিকিৎসা করাতে আসেন। স্বাভাবিকভাবেই রোগীর চাপ অনেক বেশি। হাসপাতাল সুপার ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী জানান, কলকাতা বাদ দিলে, মফঃস্বলের মধ্যে বহরমপুরেই সব থেকে বেশি রোগী পরিষেবার জন্য আসেন। এই কারণেই সদর হাসপাতাল থাকলেও রোগীর চাপ কমানোর জন্য ষাট-সত্তরের দশকে বহরমপুর শহরের উপকণ্ঠে একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিউ জেনারেল হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। যেমন রাজ্যের অনেক জেলাতেই স্টেট জেনারেল হাসপাতাল আছে। বহরমপুরে দুটি হাসপাতাল আলাদা সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী (G.O) গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে হাসপাতাল দুটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার সরকারি উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। জোড়াতালি দিয়ে হাসপাতাল দুটিকে চালানো হতে থাকে। বিশ্বব্যাঙ্ক তথা স্বাস্থ্য প্রজেক্টের কোটি কোটি টাকা খরচ হয় অথচ হাসপাতাল দুটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার কোন চেষ্টাই হয়নি। বরং বাইরে আলাদা সাইন-বোর্ড থাকলেও দুটি হাসপাতালের সমস্ত বেড সংখ্যা যোগ করে একটিই হাসপাতাল বলে কাজ চালানো শুরু হয়। এরই মধ্যে নিউ জেনারেল হাসপাতালে নতুন ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপনের নামে সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্প্রতি জেলা সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগটিকেও স্থানান্তরণের প্রচেষ্টা চলছে। দুটি হাসপাতালকে একই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে কার্যত সদর হাসপাতালটিকে তুলে দেবার চক্রান্ত হচ্ছে বলেই মনে করেন বহরমপুরের মানুষ। যদিও জেলা ও জেলার বাইরের আগত রোগীর সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বহরমপুর শহরের দুটি হাসপাতালকেই পৃথক, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নত করে গড়ে তোলা বাস্তব প্রয়োজন। উল্লেখ্য ২০০০ সালে সি পি এম পরিচালিত জেলাপরিষদ ও জেলা স্বাস্থ্য কমিটি পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ স্থানান্তর করার উদ্যোগ নেয়। সেই সময় সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে প্রতিবাদ আন্দোলন হয়। বিক্ষোভ, অবস্থান, ডেপুটেশন, অনশন ইত্যাদি কর্মসূচি পালিত হয়। গড়ে ওঠে 'বহরমপুর সদর হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি'। প্রবল গণবিক্ষোভের চাপে সেই সরকারি উদ্যোগ স্থগিত রাখা হয়। তারপর জেলা পরিষদ কংগ্রেসের দখলে এলে বর্তমানে আবার সদর হাসপাতাল স্থানান্তরণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এরই প্রতিবাদে 'বহরমপুর সদর হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি'র পক্ষ থেকে ২১ মার্চ নাগরিক কনভেনশন আহ্বান করা হয়েছিল। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন শহরের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ প্রণব কুমার সেন। কনভেনশনে অধ্যাপক দীপক কুমার বাগচী বলেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সমস্ত ক্ষেত্রে এই সরকারি উপেক্ষা থেকে প্রশ্ন জাগে আসলে সরকার কাদের। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অশীতিপর প্রবীণ সুশীলকুমার ঠাকুর বলেন, কেন্দ্র রাজ্য সব সরকারই মানুষের শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। বহরমপুর সদর

সাতের পাতায় দেখুন

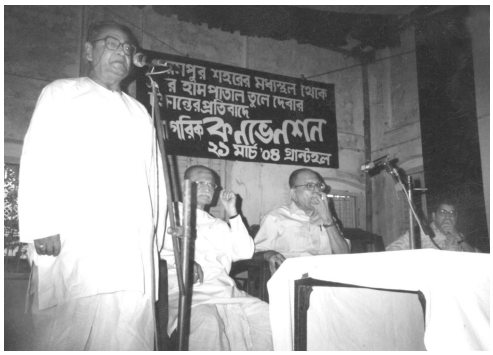

বক্তব্য রাখছেন সুশীল কুমার ঠাকুর। মঞ্চে বসে আছেন প্রশান্ত বাগচি, ডাঃ প্রণব সেন, দীপক বাগচি ও সমীর ধর

তারকাদের আড়ালে মুখ ঢাকতে চাইছে

একের পাতার পর

তারকা এসে যুক্ত হচ্ছেন মূলত বি জে পিতে, তারপরেই কংগ্রেসে। অন্যদেরও চেষ্টার ত্রুটি নেই। কল্পনার জগতের এই মানুষগুলি শাসকদলগুলির হয়ে স্বপ্ন ফেরি করবেন দেশের প্রান্তে প্রান্তে। মুম্বইয়ের 'মিড ডে' পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্য এজন্য তাঁদের মূল্য চুকিয়ে দিচ্ছে। এই মূল্য জনসভা পিছু এক থেকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। কেউ বা আবার কাজ করবেন ফুরনে, অর্থাৎ এককালীন চুক্তিতে — যা কোটি টাকা পর্যন্ত। কেউ কেউ নগদ অর্থ কিছুই নেবেন না, শুধুই জনসেবা করবেন। তবে ওই একটু পদ্মশ্রী, দিল্লিতে একটু জমি বা সামান্য কিছু ট্যাক্স ছাড় — এ তো আর ধর্তব্যের মধ্যে নয় !

এই সব তারকারা কীসের টানে ভোটের ময়দানে এসে জড়ো হচ্ছেন তার না হয় সহজবোধ্য ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির এই দেউলিয়াপনা কেন ? এতদিন পর্যন্ত যার যেমন নীতি-আদর্শ বা কর্মসূচি, তাকে সামনে রেখেই রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে লড়েছে, মুখে হলেও নীতির কথা তাদের বলতে হয়েছে, যদিও শেষপর্যন্ত টাকা, রিগিং, সন্ত্রাস, গুণ্ডাবাজি এবং প্রচারই নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেছে। রাজনীতির অঙ্গনে তারকাদের এমন লাইন-লাগা ভিড় আগে কখনো ঘটেনি। দু-একজন তারকা কখনো কখনো কোন কোন দলে যোগদান করলেও এভাবে টাকার বিনিময়ে তাঁদের জনআকর্ষণী ক্ষমতাকে ভোটের কাজে লাগানোর ঘটনা বিশেষ একটা ঘটেনি। আসলে এসবই পরিষদীয় রাজনৈতিক দলগুলির চূড়ান্ত দেউলিয়াপনারই নিদর্শন।

রাজনীতি একটি উচ্চ হৃদয়বৃত্তি — যা আদর্শের টানে নিজস্ব সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়ে মানুষকে সামাজিক কল্যাণে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। রাজনীতি চরিত্র দেয়, মনুষ্যত্ব দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের এ ধারণাই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে সংসদীয় দলগুলি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের কাছে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার ফলে, সরাসরি এই দলগুলির রাজনীতি শোষণের পক্ষেই দাঁড়িয়ে যায়। এদের এই ভূমিকা ধীরে ধীরে রাজনীতির মহত্ত্বকে মেরে দিয়ে, সমস্ত মূল্যবোধকে ধ্বংস করে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা, চুরি, দুর্নীতি এবং মিথ্যাচারের আখড়ায় পরিণত করেছে, বাজারের কেনা-বেচার পণ্যে পরিণত করেছে। এর ফলে ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের বিশ্বাসযোগ্যতাও এই দলগুলি হারিয়েছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দেউলিয়া রাজনীতির রূপটি আজ সাধারণ মানুষের চোখে আরও বেশি বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোনও ভারত উদয়, কোনও ইন্ডিয়া সাইনিং, রেডিও-টিভি-খবরের কাগজে উন্নয়নের কোনও বিজ্ঞাপনেই আজ আর সাধারণ মানুষের দুরবস্থাকে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। সরকারি দলগুলি বিপুল ব্যয়ে দেশজুড়ে উন্নয়নের এক কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও জিনিসপত্রের বল্গাহীন দামবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি, ছাঁটাইয়ের ধাক্কায় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই এই দলগুলির নেতাদের ভাষণ শুনতে আজ আর সাধারণ মানুষ জড়ো হন না; ফলে রূপালি জগতের তারকাদের টেনে আনতে হচ্ছে রাজনীতির অঙ্গনে — নীতি-আদর্শের পরিবর্তে গ্ল্যামারের চড়া আলোয় জনসাধারণের চোখ ঝলসে দেওয়ার জন্য।

সংশ্লিষ্ট দলগুলির নেতারা সাধারণ মানুষকে বোঝাচ্ছেন, তারকারা নাকি আদর্শের টানেই দলে আসছেন। তাই যদি হয়, তবে শুধু ভোটের সময়েই তাঁদের আদর্শের প্রতি টান বাড়ে কেন? আর কেনই বা গত নির্বাচনে যাঁরা কংগ্রেসের হয়ে ভোট টানার কাজ করেছিলেন, এবার তাঁরা বি জে পি-তে নাম লিখিয়েছেন বা অনেক ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই ঘটছে? আসলে, কংগ্রেস আর বি জে পি-তে যেমন নীতিগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই — পরস্পর লড়াইটা শুধু ক্ষমতা দখলের, এইসব তারকাদেরও তেমনি নীতি-আদর্শের কোনও টান নেই, টান শুধু অর্থ, প্রভাব, প্রতিপত্তির। যে দলে তা বেশি পাওয়া যাবে, তারাও সেই দলেই ভিড়বেন।

একটি দল তো তারকাদের রীতিমত ট্রেনিং দিচ্ছে — কোথায় কী বলতে হবে, কীভাবে বলতে হবে ইত্যাদি। অর্থাৎ কল্পলোকের এই মানুষগুলি, যাঁদের দেশের আপামর সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, তাদের দুঃখ-কষ্ট, চাওয়া-পাওয়া, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই, তাঁরা প্রচারের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কিছু শেখানো বুলি আওড়াবেন, আর বার বার নেতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে ভুলে ঠকতে থাকা মানুষগুলির চোখ আবারও একবার তাঁদের গ্ল্যামারে ধাঁধিয়ে যাবে। নইলে, এই সমস্ত তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন কী? লোভ, লালসা, কর ফাঁকি, বিলাসবহুল জীবনযাপনের বাইরে দেশের মানুষের জন্য কোন্ ভূমিকা তাঁরা পালন করেছেন? রাজনীতিতে মূল্যবোধকে শাসকদলগুলি আগেই ধ্বংস করেছে, তবুও যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, এর ফলে তাও ধ্বংস হবে — যা শেষ পর্যন্ত মূল্যবোধের সামাজিক মানটিকে আরও নিচে নামিয়ে দেবে। এই নীতি-মূল্যবোধহীন রাজনীতিই দেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার রাস্তাকে প্রশস্ত করবে।

এবারের নির্বাচনও শেষ হবে। আখের গুছিয়ে নেবেন তারকারা, চরিতার্থ করবেন তাঁদের আকাঙ্খা। নগদ বিপুল অঙ্কের অর্থ মূল্য পাবেন, কেউ এম পি হবেন, মন্ত্রী হবেন, কেউ বা রাজ্যসভায় আসন পাবেন, আবার কেউ পদ্মশ্রী বা রাজধানীর অভিজাত এলাকায় সস্তায় বা বিনামূল্যে জমি পাবেন, নিদেনপক্ষে বিপুল পরিমাণ কালো টাকাকে সাদা করতে মোটা অঙ্কের করছাড় পাবেন। অপরদিকে, ভোটবাজ রাজনৈতিক নেতারা পাঁচ বছরের জন্য আসমুদ্রহিমাচল ধরিত্রীর অধীশ্বর হবেন, চুরি-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হবেন, জনগণের টাকা আত্মসাৎ করবেন — আর মানুষকে বিভ্রান্ত করতে মাঝে মাঝে উন্নয়নের গল্প শোনাবেন। কিন্তু কী পাবেন দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ? তাঁরা আবারও প্রতারিত হবেন, কল্পজগৎ থেকে ছিটকে পড়বেন বাস্তবের কঠিন কঠোর জমিতে।

তারকাদের সাথে সংসদীয় দলগুলির এই লেনদেনের বিপুল অঙ্কের টাকা আসছে কোথা থেকে? কারাই বা তা যোগাচ্ছে? যোগাচ্ছে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা — যারা এই টাকা নির্বাচনের পরে কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেবে সাধারণ মানুষের ঘাড় ভেঙে। তার জন্য মূল্যবৃদ্ধি সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও এই সরকারি দলগুলি করে দেবে।

তাহলে উপায় কী? নির্বাচন আসবে, নির্বাচন যাবে, আর এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকবে? নাকি একদিন এমন কোন যাদুপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি এই সকল নোংরামি, দেউলিয়াপনা আর চালাকি থেকে মুক্ত করবেন আমাদের? না, তা অবশ্যই ঘটবে না। যা করার আমাদেরই, সাধারণ মানুষকেই করতে হবে। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাব না — এ কোনও কাজের কথা নয়; রাজনীতি শয়তানের পেশা — এতেও সান্ত্বনা খোঁজা নয়। যাচাই করতে হবে দলের নীতি, নেতাদের চরিত্র; চিনে নেওয়া দরকার কোন্ রাজনীতি শয়তানের, আর কোন্‌টা সত্যিই এই শোষণ, নিপীড়ন আর মিথ্যাচারে ভরা সমাজটাকে বদলাতে চাইছে। কাটিয়ে তুলতে হবে রাজনীতি সম্পর্কে মালিকদের সৃষ্টি করা সমস্ত ভীতি। একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এই ভীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের প্রতারিত করার ওদের আসল শক্তি।

নারী নির্যাতন

চারের পাতার পর

ধনী-গরিবে শ্রেণীবিভক্ত। উচ্চবর্ণ মাত্রই সম্পত্তিবান নয়। ভারতবর্ষের শোষিতশ্রেণীর শিবির — সকল বর্ণ, জাতি, উপজাতি, সকল ধর্মের নরনারীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের যোগফলেই গঠিত। অর্থনৈতিক অবস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে তফসিলি জাতি উপজাতি সহ নিম্নবর্গের শোষিত জনতার পশ্চাৎগামিতা এবং পাশাপাশি ধর্মীয় অর্থে সংখ্যালঘু মুসলমান গরিব জনসংখ্যার পশ্চাৎগামিতার কারণ নিহিত আছে দেশ ও জাতিগঠনের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। ধর্মবিশ্বাসের কারণে খুন-ধর্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে বর্তমান সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার আয়োজনে কংগ্রেস-বিজেপি সহ বিভিন্ন শাসকদলের ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক ও বর্ণ বৈষম্যবাদী রাজনীতি যেমন দায়ী, তেমনই দায়ী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতা — যা প্রধানত ছিল হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ — যা সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণার সঙ্গে আপসমুখী বিরুদ্ধবাদী ভূমিকা নিয়েছিল। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য জন্ম নিয়েছিল কেন?

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্বকারী বুর্জোয়াশ্রেণী, আন্তর্জাতিক দিক থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী যখন বৈপ্লবিক চরিত্র হারিয়ে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে, সেই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই ছিল। কাজেই বুর্জোয়াশ্রেণী বৈপ্লবিক ভূমিকা নেওয়ার মতো অবস্থানে ইতিহাসগতভাবেই ছিলনা। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে আমাদের দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে এই ভূমিকাকে — 'সংস্কারবাদী' ও 'বিরুদ্ধবাদী' বলে চিহ্নিত করেছেন। লেনিন দেখিয়েছেন, বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের যুগে দেশে দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রমিক বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কিত বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে আর সম্পূর্ণ হতে পারে না — যদি হয় তাহলে তা হবে আধসেঁকা রুটির মতো। তা একমাত্র সফল হতে পারে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে যদি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। এদেশে কমিউনিস্ট পার্টিটি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি না হওয়ায় এই ঐতিহাসিক শর্ত পূরণ করা সম্ভব হয়নি। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর অমূল্য বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, এই কারণেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে উপজাতীয় মানসিক জটিলতা মিশে থাকল, জাতিপীড়ন থাকল, বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় সংস্কার ও প্রাধান্যও জনজীবনে থাকল। বুর্জোয়া অর্থেও নারীমুক্তি ঘটেনি।

বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষায়, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্রে, সমাজে, আচার-বিচারে, আইন-আদালতে সামন্তী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে গেল। আর সিডিউলড কাস্ট ফেডারেশন জন্ম নিল সেই সময়েই। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম থেকে ব্যাপক মুসলিম জনতা বিচ্ছিন্ন থেকে গেল। বিচ্ছিন্ন থেকে গেল তফসিলি উপজাতিগুলিও অনেকাংশেই। জাতীয় সংগ্রামের ধারায় সমাজের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ ছিল তাও ব্যাহত হল। নারীজাতির মধ্যেও গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার প্রসার ব্যাহত হল। নারীমুক্তির তথা নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটাও অমীমাংসিতই থেকে গেল। এজন্যই ধর্মবর্ণের কারণে নারীর ওপর নির্যাতন-পীড়ন-ধর্ষণ-হত্যা থেকে গেল — থেকে গেল ডাইনি সন্দেহে হত্যা, হরিজন নারী ধর্ষণ-হত্যার মত বর্বরতা। সামন্তী সংস্কারে শৃঙ্খলিত নারীর ওপর ঘরে-বাইরে গোপন ও প্রকাশ্য নির্যাতন নব নব রূপে চলতেই থাকলো। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষেও পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতার ধারাটি তো অব্যাহত থাকলোই — উপরন্তু শাসক দলগুলি পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য ধর্ম-বর্ণ-উপজাতীয় মানসিকতাকে, প্রাদেশিকতাকে কাজে লাগিয়ে, উস্‌কে দিয়ে, ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের সৃষ্টি করে শোষিত শ্রেণীর ঐক্যে ফাটল ধরালো। এই চেষ্টা আজও অব্যাহত।

কত বছর আগে ইসলাম নারীকে সম্পত্তির অধিকার দিয়েছিল। এ সত্ত্বেও মুসলিম নারীর আকাঙ্খিত ব্যক্তিত্ববিকাশ হতে পারল না। পুঁজিবাদ থাকতে তা হতে পারে না। শিক্ষায়, চাকরিতে — বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশে মুসলিমরা আজও কত পিছিয়ে। ১৯৮১ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে দেশে ৩৮৮৩ জন আই এ এস অফিসারের মধ্যে মাত্র ১১৬ জন মুসলমান। ১৭৫৩ জন আই পি এস এর মধ্যে মাত্র ৫০ জন মুসলমান। রাজ্য সরকারি কর্মচারী ৩.৩০ শতাংশ, কেন্দ্রীয় সরকারি ক্লাস ওয়ান অফিসার ১.৬১ শতাংশ মুসলমান (ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি ৩-১১-৯০) দারিদ্র্যসীমার নিচে মুসলিম জনসংখ্যার হার ৫০ শতাংশ। আর এরই মধ্যে মুসলিম নারী কোথায় কতটুকু পাওয়া যাবে? এমনটাই কি হওয়ার কথা ছিল?

সুতরাং পুঁজিবাদকে খতম করার সাথে যেমন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটিও জড়িত, তেমনি জড়িত নারী মুক্তির প্রশ্ন। কমিউনিস্ট ইসতেহার আজ থেকে বহুপূর্বে ঘোষণা করেছে ঃ সম্পত্তির যে বর্তমান রূপ আমরা দেখছি তা দাঁড়িয়ে আছে পুঁজি এবং মজুরি-শ্রমের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের উপর। ...কিন্তু মজুরি-শ্রম কি মজুরের জন্য কোন সম্পত্তি সৃষ্টি করে? বিন্দুমাত্র নয়। তা পুঁজির জন্ম দেয়। ...পুঁজি একটি যৌথসৃষ্টি, সমাজের বহু সদস্যের যৌথক্রিয়া — আরও সঠিকভাবে বললে — শেষ পর্যন্ত সমাজের সকল সদস্যের যৌথক্রিয়ার দ্বারাই পুঁজিকে সবল করা যায়। ফলে পুঁজি ব্যক্তিগত শক্তি নয় — তা একটা সামাজিক শক্তি।'' এই সামাজিক শক্তিকে পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করেছে এবং তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেছে। তাই বলা হল ঃ ''আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটাতে চাই — শুনে আপনারা ভয়ে আঁৎকে ওঠেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই আপনাদের প্রচলিত সমাজে জনসংখ্যার দশ ভাগের নয় ভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি শেষ করে দেওয়া হয়েছে। ...সুতরাং আমরা যে সম্পত্তির অবসান ঘটাতে চাই বলে আপনারা অভিযোগ করছেন তা হচ্ছে এমন সম্পত্তি যার অস্তিত্বের শর্ত হচ্ছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে সম্পত্তি না থাকা। এককথায়, আপনাদের অভিযোগ হল আমরা আপনাদের সম্পত্তির অবসান ঘটাতে চাই। ঠিক তাই - আমরা সেটাই চাই।''

সুতরাং সোজাসুজি ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে — ''আজকের পরিবার, বুর্জোয়া পরিবার কোন্ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে? দাঁড়িয়ে আছে পুঁজির ওপর, ব্যক্তিগত লাভের ওপর। পুঁজির অবলুপ্তির সাথে সাথে অনিবার্যভাবে বুর্জোয়া পরিবারও লুপ্ত হবে। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা অবসানের সাথে সাথে এই ব্যবস্থা যেভাবে মেয়েদের যৌথভোগের বস্তুতে পরিণত করেছে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্তরে ও সমাজজীবনে উভয় ক্ষেত্রেই যে পতিতাবৃত্তির জন্ম দিয়েছে — তারও অবসান ঘটাতে বাধ্য।''

এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে একটি কথা স্মরণীয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ হলেও ব্যক্তিসম্পত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ব্যক্তিসম্পত্তি জাত মানসিক জটিলতা (private property mental complex) থেকে মুক্তি না ঘটলে নারীর ওপর পুরুষের একধরনের আধিপত্য থেকেও যাবে বিশেষ সূক্ষ্ম ও জটিল রূপে। আবার নারীর মানসিকতাও এর প্রভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

সুতরাং ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে সঠিক সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূরিত কাজগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই গতিপথেই সম্পন্ন করতে হবে। এই পথেই ত্বরান্বিত হবে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত নারীমুক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর আত্মদান এই পথেই হয়ে উঠবে সার্থক। নিঃসন্দেহে এই সংগ্রামগুলিকে সংযোজিত করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে। কংগ্রেস-বিজেপি'র মতো পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলি ঐতিহাসিক কারণেই নারী মুক্তি নয় — নারী নির্যাতনের শক্তিরই আজ প্রতিভূ। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে আপোষের শক্তি হিসাবে সি পি এমের মত তথাকথিত বামপন্থী ও কমিউনিস্ট নামধারী দলগুলিও আর নারীমুক্তি আন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন করতে অপারগ। তারাও পর্যবসিত হয়েছে নারীঘাতী এক শক্তিতে — যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখছি গণআন্দোলন তথা নারী আন্দোলন দমনে পাশবিক বর্বরতার মধ্যে।

এই অবস্থায় পুঁজিবাদ উচ্ছেদের মহতী সংগ্রামে সারা দেশের নারী সমাজকে সামিল করতে অভ্যুত্থান হয়েছে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে — মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন-এর, যার আন্দোলন আজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রতিটি প্রান্তে। (সমাপ্ত)

২৫শে ঘেরাও, ২৬শে দাম পেল টমাটো চাষীরা

কোচবিহার জেলার হলদিবাড়িতে ৫ টাকা মণ দরে টমাটো বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছিল চাষীরা। প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে হাজার চাষী ২৫ মার্চ বিডিও অফিসে অবরোধ ঘেরাও করে। প্রশাসন নড়ে বসে, আড়তদাররা পিছু হটে। ২৬ মার্চ থেকে টমাটোর দাম বেড়ে হয়েছে ৫০ টাকা মণ।

দ্বিচক্রযান মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া কর অবিলম্বে ফেরৎ দাও

ট্রু হুইলার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ ২৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, দ্বিচক্রযান মালিকদের ওপর অন্যায় ও বেআইনিভাবে জীবনকালীন কর চাপানোর যে আইন রাজ্য সরকার করেছিল, তাকে কলকাতা হাইকোর্ট গত ২৫ মার্চ এক রায়ে অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছে। এই রায় গণআন্দোলনের বিজয়কেই সূচিত করল। দ্বিচক্রযান মালিকদের কাছ থেকে আদায় করা সমস্ত টাকা অনতিবিলম্বে ফেরত দেবার জন্য শঙ্কর ঘোষ রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বহরমপুর সদর হাসপাতাল

ছয়ের পাতার পর

হাসপাতাল তুলে দেবার বিরুদ্ধে আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলব। কিন্তু সরকার হিংস্র হলে মানুষও শান্ত থাকবে না। শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী সমীর ধর বলেন, সদর হাসপাতাল তুলে দেবার চক্রান্ত আসলে মানুষকে চিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, এর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন গড়ে তুলব। ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনীশ সিনহা বলেন, বিশ্বায়নের করাল থাবার অনিবার্য পরিণতি এই হাসপাতাল তুলে দেবার চক্রান্ত। সদর হাসপাতালকে রক্ষার জন্য সংগঠিত আন্দোলন চাই। বহরমপুর ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ী সুধীর নাথ বলেন, সদর হাসপাতালকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আমরণ অনশন করব। মুর্শিদাবাদ জেলা চেম্বার্স অব কমার্সের সভাপতি প্রশান্ত বাগচী সকলকে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এছাড়া কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন, চন্দ্রকান্ত ললিত মোহন খাদি সেবা সমিতির সহ সম্পাদক প্রণব চৌধুরী, শহরের প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দ্রমাধব বোস, প্রাক্তন কাউন্সিলার নবকৃষ্ণ চ্যাটার্জী প্রমুখ। বহরমপুর সদর হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে কৌশিক চ্যাটার্জী বলেন, বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই আর্থিক সঙ্কটের দোহাই দিয়ে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবা কেড়ে নিচ্ছে, ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, হাসপাতাল বিক্রি করে দিচ্ছে বা তুলে দিচ্ছে, অন্যদিকে শিল্পপতিদের হাজার হাজার কোটি টাকা কর ছাড় দিচ্ছে, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে। বহরমপুর শহরের মানুষের প্রশ্ন, সি পি এম পরিচালিত জেলা পরিষদের সদর হাসপাতাল তুলে দেবার সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের জেলা পরিষদ কার্যকর করছে। তবে কি এদের নীতি একই?

কনভেনশনের সভাপতি ডাঃ প্রণব কুমার সেন বলেন, কোনো মতেই সদর হাসপাতালকে তুলতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কনভেনশনে আগামী দিনে বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচীর পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং ডাঃ প্রণবকুমার সেনকে সভাপতি ও সত্য কর্মকারকে সম্পাদক করে শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের উপদেষ্টা রেখে বহরমপুর সদর হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি পুনর্গঠিত হয়। কনভেনশনের গরিব সাধারণ মানুষ, মহিলা, ছাত্র যুব থেকে ব্যবসায়ী শিক্ষক, আইনজীবী সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

বিজেপি'র 'ভারত উদয়'

কমানো হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ

১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে	ব্যয় কমানোর নামে কমানো হলো কর্মসংস্থানের সুযোগ।
২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে	নিয়োগ বন্ধের ফতোয়া, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণ ত্বরান্বিত।
২০০১-২০০২ আর্থিক বছরে	দু'শতাংশ হারে ৫ বছরে ১০ শতাংশ সরকারি কর্মী হ্রাস। গত বছর ১ মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৩৭,৭৬,৬৬৬ জন। এক বছরে হ্রাস পেয়ে তা হয়েছে ৩৪,৫৫,০০৭ জন। রেলে কমানো হয়েছে ২৪,০০০ পদ।
২০০২-২০০৩ আর্থিক বছরে	১২,২০০ কেন্দ্রীয় কর্মচারী পদ অবলুপ্তির ঘোষণা। ছাঁটাইয়ের মুখে ৪২,০০০ উদ্বৃত্ত কর্মী।
২০০৩-২০০৪ আর্থিক বছরে	৩৬টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিভিন্ন বিভাগে ২৩,৯০১ পদ অবলুপ্তির জন্য চিহ্নিত করা হয়।

দেশে কাজ হারিয়েছে ৫৫ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী

১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ৪৫ লক্ষ কর্মচারী কাজ হারিয়েছে। এই সংখ্যা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় শ্রমশক্তির ১৫ শতাংশ। বেসরকারি সংস্থাগুলিতে কাজ হারিয়েছে ১০ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী (নিউজ উইক ১৫-৩-০৪)।

বামফ্রন্ট চলেছে কেন্দ্রের পিছু পিছু

বেকার বাড়ছে

২০০১	—	৬১,৯০,০১০
২০০২	—	৬৩,৩০,০০০
২০০৩ (অক্টোবর)		৬৬,৬৭,০০০

গত তিন বছরে বেকার সংখ্যা বেড়েছে বছরে গড়ে ২ লক্ষ ৯০ হাজার করে।

''...মন্ত্রী নিরুপম সেনের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পদপ্তরের অধীন বেশ কয়েকটি সংস্থায় উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদ ফুরনোর আগেই বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে''....(বর্তমান ২-৯-০২)।

বিধানসভায় ১৭ মার্চ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী বংশগোপাল চৌধুরি জানান, ''তন্তুজকে লাভজনক করতে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, অলাভজনক দোকানগুলি বন্ধ করে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে'' (বর্তমান ১৮-৩-০৪)।

কর্মী বিন্যাসের নামে কর্মী সঙ্কোচনের উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

সরকারি দপ্তরগুলিতে এই মুহূর্তে কত কর্মী প্রয়োজন তা জানতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন।... কিন্তু সব দপ্তর রিপোর্ট না দেওয়ায় কর্মী বিন্যাসের কাজটি আটকে আছে। ... রাজ্য সরকারের কর্মী বিন্যাসকে কর্মী সঙ্কোচনের পথ বলে মনে করছে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনগুলি। সি পি এম প্রভাবিত সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটিও এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে। (বর্তমান ২৭-৩-০৪)

কেন্দ্রে ভি আর এস রাজ্যে ই আর এস

বহুনিন্দিত ভি আর এস নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনছে ই আর এস (আর্লি রিটায়ারমেন্ট স্কিম)। ১৭ মার্চ বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেছেন — ''লোকসানে চলা চারটি অধিগৃহীত সংস্থা রাজ্য সরকার নিজের হাতে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'' কারণ ''ওই চারটি সংস্থা এখন অল্প লোকসানে চললেও ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে বলে তাঁরা মনে করেন।'' এই চারটি সংস্থার ''কর্মীদেরও ই আর এস দেওয়া হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানান।'' (বর্তমান ১৮-৩-০৪)

ইউনিট হোল্ডাররা সুখে ডুবছেন

বিজেপির সোচ্চার নির্বাচনী প্রচারে যখন ''সুখের হাওয়া'' বইছে তখনই বিজেপি সরকার নিরুচ্চারে সাধারণ মানুষের হাড়ে বাতাস লাগাবার ব্যবস্থা করছে ইউনিট ট্রাস্টের সাতটি প্রকল্প মেয়াদ ফুরনোর আগে তুলে দিয়ে। চিলড্রেন গিফট গ্রোথ ফান্ড ১৯৮৬ ও ১৯৯৯, ভূপাল গ্যাস ভিক্টিম মাস্থলি ইনকাম প্ল্যান ১৯৯২ সহ এই সাতটি প্রকল্প যে কত লাভজনক কেন্দ্রীয় সরকারই তা অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করার সময় এসব প্রকল্পে কমবেশি ১২ শতাংশ পর্যন্ত সুদের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। এখন সেই প্রতিশ্রুতি খেলাপ করছে বিজেপি সরকার। কারণ সঙ্কটের মধ্যেও একচেটিয়া মালিকদের লাভ ও লুঠ নিশ্চিত করতে সুদ তারা কমিয়ে দিচ্ছে দফায় দফায় যার ধাক্কাটা সইতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

বহরমপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ মিছিল

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিরোধ, ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল, অ্যাডিশনাল সিকিউরিটির টাকা ফেরৎ সহ জেলার নানান সমস্যা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পক্ষ থেকে জেলা শাসক ও জোনাল ম্যানেজারের কাছে গত ১৭ মার্চ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কুনাল বিশ্বাস। তিনি বলেন, একদিন যে বিদ্যুৎ ছিল পরিষেবা, তাকে আজ বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণ করার নীতি নিয়ে চলছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার।

ব্যাপক লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ, ভুতুড়ে বিল, বিল পরিশোধ সত্ত্বেও আউট স্ট্যান্ডিং বিল পাঠানো সহ বিবিধ সমস্যার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পরিকাঠামোর দুর্বলতার জন্য ইতিমধ্যেই জিয়াগঞ্জে তার ছিঁড়ে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। পোলের তার সঠিক উচ্চতায় না থাকায় পাট বোঝাই তিনটি লরীতে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

উল্লেখিত সমস্যাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি না হলে সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

জেলা সভাপতি বাণী ইসরাইল, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাপী ঘোষ, জহরবাবু প্রমুখ জেলা নেতৃবৃন্দ ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রথমে ডি এম-এর প্রতিনিধি এবং পরবর্তীতে জোনাল ম্যানেজারের প্রতিনিধি সিনিয়র এস.ই. ডেপুটেশন গ্রহণ করেন। তিনি সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, এগুলি অতি দ্রুত সমাধান করা হবে।

আন্দোলনে সরকার শঙ্কিত

একের পাতার পর

দোকানই নয়, রেশন দোকান থেকেও মদ বিক্রি করলে তা মানুষ কিনবে এবং তাতে সরকারের রাজস্ব আরও বাড়বে। বাজারে চাহিদা অনুযায়ী যোগান, আবার প্রচার করে যোগান বাড়িয়ে চাহিদা বাড়ানো — কোন্ অর্থনীতির নিয়ম তা সকলেরই জানা। লক্ষ্যণীয় হল, সি পি আই (এম) আজ পুঁজিবাদের একনিষ্ঠ সেবকের মত সেই পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তারা বুঝে গিয়েছে, এ ছাড়া ক্ষমতায় টিকে থাকার, ক্ষমতার মধু ভোগ করার ও আখের গোছানোর আর কোন সহজতর রাস্তা নেই।

কিন্তু এতো গেল সি পি আই (এম)-এর গদির স্বার্থের কথা। কিন্তু এতে সমাজের পরিস্থিতিটা কী হবে? সামান্য একটু চোখ খুললেই তা বোঝা যাবে। এ বছর দোলের পরদিন খবরের কাগজ হাতে আসতেই মানুষ পড়েছে কয়েকটি ন্যক্কারজনক নৃশংস ঘটনার কথা। বর্ধমানের এক গ্রামে কয়েকজন যুবক রঙ দেওয়ার অছিলায় কয়েকজন কিশোরীকে ও গর্ভবতী মহিলাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। কোথাও এক যুবক মোটর সাইকেল চালিয়ে আরেক যুবককে হত্যা করেছে। কোথাও কিছু যুবক পুলিশ কনস্টেবলের রাইফেল কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে তাকেই বেধড়ক মেরেছে। এই যুবকরা সকলেই ছিল মদ্যপ। এছাড়াও রয়েছে মদ্যপদের অশালীন আচরণের প্রতিবাদ করায় বনগাঁর এক পুরপিতার জখম হওয়া, নীলরতন সরকার হাসপাতালে ডাক্তারদের প্রহৃত হওয়া এবং একবালপুর থানার বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ীপুত্র খুনের ঘটনা। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ছিল মদ্যপ। অর্থাৎ দোলের দিন কোথাও কোথাও মহানন্দে, কোথাও মহাক্রোধে মদ্যপান করে কিছু যুবক ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড জাতীয় জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করেছে। সিনেমা-টিভি ইত্যাদির দৌলতে আত্মসর্বস্ব ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কুপ্রভাবে দেশের মানুষ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস ও মদে আসক্তি ইতিমধ্যে যে হারে বেড়েছে — স্পষ্টত তারই ফলশ্রুতিতে এই ধরনের অপরাধের ঘটনাও বাড়ছে। ফলে সি পি আই (এম) ''সমাজে মদের চাহিদা বেড়েছে'' বলে যা বলছে — এই হল তার পরিণাম। এরপর যদি অলিতে-গলিতে-রেশন দোকানে, স্কুল কলেজের পাশে মদ বিক্রি হতে থাকে সরকারি প্রশ্রয়ে আইনী বৈধতা নিয়ে — তাহলে তার পরিণাম কি আরও সাংঘাতিক হবে না?

প্রশ্ন হল, মানুষ তাহলে এখন করবে কী? প্রথমত দেখাই যাচ্ছে, সিদ্ধান্ত নিয়েও তাকে কার্যকর করতে সি পি এম দশবার ভাবছে এবং তার জন্য তাদের যে একদিকে 'নজর রাখছি' গোছের হম্বিতম্বি করতে হচ্ছে এবং অন্যদিকে সমাজে 'চাহিদা বাড়ছে, কী করা যাবে' — এই জাতীয় কুযুক্তির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এসবের একটাই কারণ — সি পি আই (এম)-এর এই ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে এস ইউ সি আই দলের যুব-ছাত্র সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই ডি এস ও রাজ্যের সর্বত্র এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলছে। পাড়ায় পাড়ায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একত্রিত করে নাগরিক কনভেনশন, যুব কনভেনশনের মধ্য দিয়ে নাগরিক কমিটি ও যুব কমিটি গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলনের পাশে সাধারণ মানুষ গভীর উদ্বেগের সাথে সমবেত হচ্ছেন। জনমতের এই চাপেই সি পি এম-এর কিছুটা থমকে দাঁড়ানো। এ ঘটনা একটা কথাই বোঝায় — আন্দোলনই হল একমাত্র পথ, যার দ্বারা যেকোন জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপকে রদ করা, নিদেনপক্ষে আটকানো সম্ভব। এই প্রতিবাদটুকু ছিল বলেই প্রতিরোধ হয়েছে। এটুকু না থাকলে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সি পি এম-এর দেরি হত না।

কিন্তু একইসঙ্গে বোঝা দরকার, স্থায়ী হোক, অস্থায়ী হোক, প্রতিরোধ বা রদ — আন্দোলনের চাপে যতটুকু ফল পাওয়া যাক না কেন, দু'দিন বাদেই আবার এই সিদ্ধান্ত হয়তো অন্যরূপে, অন্য ভাষায় ফিরে আসতে পারে। কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা এমন সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে যে, তাকে টিকে থেকে মুনাফার পাহাড় গড়া অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে দরকার মানুষের, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া, ন্যায়-অন্যায় বোধ নষ্ট করে দেওয়া। তারই একটা উপায় হল মদের বন্যা বইয়ে দেওয়া। তা করতে পারলে মদ খেয়ে আনন্দ করতে করতে পাড়ারই মেয়েকে ধর্ষণ করতে যুবকদের আটকাবে না, বাইক চালিয়ে নিরীহ যুবককে নির্মমভাবে মারতে আটকাবে না। আবার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে যারা ক্ষমতায় বসে আছে — বাজার অর্থনীতির চাহিদা যোগানের ধুয়া তুলে, রাজস্ব আদায়ের নাম করে যুবশক্তিকে অধঃপাতে পাঠাবার ষড়যন্ত্র করতেও তাদের আটকাবে না। এই ষড়যন্ত্রটা বুঝে যুবশক্তি যখন এর বিরুদ্ধে যৌবনের বলিষ্ঠতা নিয়ে দাঁড়াবে, সেদিনই একমাত্র শাসকদের দিন ফুরোবে।

২০ মার্চ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবসে দিল্লিতে ধরনা

ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে এবং প্যালেস্টাইন ও ইরাকের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ২০ মার্চ দিল্লির যন্তর-মন্তরে সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম দিল্লি শাখার উদ্যোগে ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আর রাজেশ, এ কে মজুমদার, আর কে শর্মা, অনুরাগ, সতীশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net